যে ছিল আমার স্বপনচারিণী

সূত্রধরের ভাষ্য

মুঘল সাম্রাজ্যে রাজকন্যাদের বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। যেকোনও রাজপরিবারে সিংহাসন নিয়ে ভাতৃ-বিরোধ অতি সাধারণ একটি ঘটনা। এই বিরোধে যদি যুক্ত হয় জামাতারাও, তাহলে... কিন্তু বিবাহ যদি না-ই বা হয়, তাহলেও ভালোবাসা প্রস্ফুটিত হতে তো কোনও বাধা নেই। সেই স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়মে সম্রাট শাহজাহানের জেষ্ঠ্যা কন্যা জাহানারা, ভালোবেসে ফেলেছিলেন এক রাজপুত রাজাকে। তবে মুঘল অন্দরমহলে জাহানারা ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী মহিলা। যেমন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব, তেমনই ছিলেন তিনি বিদুষী। ফলে ভালোবাসায় পড়েও তাঁর মধ্যে কখনও কোনও প্রগলভতা দেখা যায়নি। তার উপর মায়ের মৃত্যুর পর পিতা শাহজাহান সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন তাঁর কন্যার উপর। এই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিও তাকে কখনও লাগামছাড়া হতে দেয়নি। জাহানারার এই ভালোবাসার খবর সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র কয়েকজনের মধ্যে। সেই কাহিনি জনসমক্ষে আসে জাহানারার নিজেরই এক ডায়েরি থেকে। জাহানারার মৃত্যুর পর এই ডায়েরি পাওয়া যায় মাটির তলা থেকে, যেখানে জাহানারা লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁর এই আত্মকথন। বর্তমান কাহিনিটি জাহানারার সেই ভালোবাসারই গল্প। ঐতিহাসিক কাহিনি যেমন ঔপন্যাসিকের হাতে পড়ে তাঁর কল্পনায় অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠে, এই কাহিনিতে তেমন কিছু ঘটেনি। বলা যেতে পারে এই কাহিনি ইতিহাসেরই এক গল্পরূপ মাত্র। কাহিনির প্রতিটি চরিত্র ঐতিহাসিকভাবে পরিপূর্ণ বাস্তব। কিন্তু কোনও মানুষের জীবনই তো সম্পূর্ণভাবে গল্পের মতো হয়ে উঠতে পারে না কখনোই। ফলে তাকে যদি কল্পনার জলে চুবিয়ে নেওয়া না হয়, তাহলে অনেক সময় কাহিনির পাঠ-মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে। বর্তমান কাহিনিতেও সেই সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারপরেও তাকে কতটা পাঠযোগ্য করে তোলা গেছে সে প্রশ্নের মীমাংসার ভার রইল পাঠকের হাতেই।

আরামবাগ
নভেম্বর ১৮, ২০২৪

অনিন্দ্য ভুক্ত

❊❊❊

এক

ঝরোকার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন জাহানারা। এখন বেলা সবে দ্বিপ্রহর পেরিয়েছে। সামান্য পশ্চিম ঘেঁষে সূর্য তীব্র উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে আগ্রার বুকে। না নড়ছে গাছের পাতা, না দিচ্ছে বাতাস। অবশ্য এখন বাতাস না দেওয়াই ভাল। দিলে যে কী হবে, তা টের পাওয়া যাচ্ছে মাঝেমধ্যে এক ঝলক বাতাস বয়ে গেলেই। সে বাতাসে তীব্র আগুনে হলকা। মাথা-মুখ যেন পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তেতে পুড়ে উঠেছে আগ্রার বেলে মাটি।

রাস্তায় এখন লোকজন কম। মাণ্ডিগুলোতে অধিকাংশ দোকানপাটের ঝাঁপই বন্ধ। যে কয়েকজন মানুষকে রাস্তায় দেখা যাচ্ছে তাদের পায়ের দ্রুতগতিই বলে দিচ্ছে, এ সময় কেউ শখ করে রাস্তায় বেরোয়নি। এরই মধ্যে দু-চারজন আসোয়ার অবশ্য এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছে। গরম বাতাসের হলকা থেকে বাঁচার জন্য তাদের মাথা-মুখ ঢাকা। বেরিয়ে আছে শুধু চোখ দু'খানি।

দুর্গের ভিতরে দাঁড়িয়ে এসবের কিছুই টের পাচ্ছিলেন না জাহানারা। পাথরের এই আগ্রা দুর্গে শীত-গ্রীষ্ম সেভাবে হামলা করতে পারে না। সেসব টের পাওয়া যায় কেবল দুর্গের খোলা চত্বরগুলিতে গিয়ে দাঁড়ালে। জাহানারা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার চারদিকে দেয়াল, মাথায় ছাদ।

ঝরোকার প্রকোষ্ঠ দিয়ে দেওয়ান-ই-আমের দরবার কক্ষের দিকেই তাকিয়েছিলেন জাহানারা। দরবারে বসেছেন বাদশা। একটু আগেই তিনি গিয়েছিলেন অন্দরমহলে, দুপুরের নাস্তা সারতে। সেখানেও একপ্রস্থ শাহি কাজ সারতে হয়েছে তাঁকে। চোখ বোলাতে হয়েছে আম-আতরাফ মানুষজনের অভাব অনুযোগের দিস্তেখানেক দরখাস্তে। প্রতিদিন এইরকম বেশ কিছু দরখাস্ত এসে হাজির হয় মমতাজ মহলের দরবারে। বেশিরভাগই এতিম বাচ্ছে, বেওয়া আওরত এবং এইরকমই আরও কিছু কমবখ্‌ত ইনসানের। বাদশা-বেগমের প্রতি বাদশার অত্যধিক দুর্বলতার কথা হিন্দুস্থানের

প্রতিটি ইনসানের জান-পহেচানের মধ্যে। তেমনই বাদশা-বেগমের নাজুক দিলের সন্ধানও সবাই রাখে। তাই প্রত্যেকেই চেষ্টা করে যার যা সমস্যা বাদশা-বেগমের দরবারে পৌঁছে দিতে। তাহলেই তার সবচেয়ে ভাল সুরাহা হওয়া সম্ভব। আর কোনও সমস্যা খোদ বাদশা-বেগমের নজরে পড়ে গেলে তো কথাই নেই। প্রতিদিন নাস্তা সারতে এসে বাদশা এইসব দরখাস্ত নিজের হাতে খোলেন, পড়েন। তারপর কারও জন্য ব্যবস্থা করেন মাসোহারার, কাউকে দেন এককালীন অনুদান, কারও জন্য বা বিশেষ ভাতা। বাদশা যখন এই কাজ সারেন, বাদশা-বেগম ততক্ষণ তাঁর নাস্তার জোগাড় করেন।

হিন্দুস্থানের বাদশা যেখানেই থাকুন, কাজ তাঁর পিছু ছাড়ে না।

জাহানারার সামনে দরবার কক্ষের সবদিকই উন্মুক্ত। কক্ষের দেয়াল বলতে এই একটি, যার সামনে জাহানারা দাঁড়িয়ে, যাকে পিছনে রেখে মসনদে বসে আছেন স্বয়ং বাদশা। এই আসনটিই এখন হিন্দুস্থানের সবচেয়ে দামি আসন। তখত-এ-তাউস।

জাহানারার চোখ কোথাও স্থির নিবদ্ধ ছিল না। সামনে দরবার কক্ষের অজস্র স্তম্ভগুলি না থাকলে হয়তো বা তা দিগন্তে বিস্তৃত হতো। কিন্তু স্তম্ভগুলিতে ধাক্কা খেতে-খেতে চোখ দু'টি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরছিল দরবার কক্ষেরই প্রান্তে, উপান্তে। শাহজাদি আজ যেন বা একটু অন্যমনা। ঘুরতে-ঘুরতে জাহানারার চোখ বারবার এসে পড়ছিল মসনদের উপরটিতে। সভাকক্ষের সবচেয়ে উঁচু এই আসনটিতে বসে আছেন সেই মানুষটি, যিনি একদিন তাঁর তাগদের জোরে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এই মূল্যবান আসনটি। মুঘল শাহির তো এই-ই নিয়ম—ইয়া তখত, ইয়া তাবুত। হয় মসনদ, নয় মওত। সিংহাসনারূঢ় তাগদদার মানুষটি দীর্ঘকায়, সুঠাম। এই মানুষটি জাহানারার আব্বা-হুজুর।

শাহজাহান এখন সাঁইত্রিশ। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর বনে-জঙ্গলে, পথে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে বাগির জীবন কাটানোর পর বছরখানেক হল তিনি হিন্দুস্থানের বাদশা। শান্ত গম্ভীর তাঁর মুখমণ্ডল। শরীরের জোশ যেন আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। দরবারে বসে আছেন, জাহানারার মনে হচ্ছিল সমস্ত দরবার যেন সেই আলোতেই উজ্জ্বল হয়ে আছে। ষোড়শী জাহানারার চোখে মানুষটি এখনও একেবারে তাজা নওজোয়ান।

আব্বা-হুজুর যেন সবসময় টগবগ করছেন। সবেতেই তাঁর আগ্রহ, সবদিকেই তাঁর উৎসাহ। সব সময় কিছু একটা করার জন্য ছটফট করছেন।

সবসময় কিছু না কিছু করে চলেছেন। এটা ভাঙছেন, ওটা গড়ছেন। বাদশাকে যাঁরা খুব বাল্যকাল থেকে দেখেছেন তাঁরা হলে হয়তো বলতেন, বাবা খুররম চিরকালই এমনই। এই যুদ্ধ করছেন, তো এই আবার বুঁদ হয়ে যাচ্ছেন দরবারি কানাড়ায়।

শাহি মসনদের কয়েক ধাপ নীচে একটি অপরিসর এলাকা রৌপ্যশৃঙ্খলে বেষ্টিত। রৌপ্যশৃঙ্খলটির রং লাল। এই রঙটি মুঘল শাহির খুব পছন্দের রঙ। একেবারে শাহি রঙই বলা যেতে পারে একে। বাদশা যখন কোথাও ছাউনি ফেলেন, তখনও সবচেয়ে উঁচু আর লাল তাঁবুটি দেখেই বলে দেওয়া যায় এই তাঁবুতেই আছেন শাহি অন্দর-মহল। বাকি তাঁবুর রং যে সব বেবাক সাদা। লাল রৌপ্যশৃঙ্খলে ঘেরা অঞ্চলটি উজির-ই-আজম ও দরবারের প্রধান আমিরদের জন্য নির্ধারিত। সেইখানে দাঁড়িয়েই তাঁরা ঘাড় ঈষৎ নীচু রেখে, গলা যতটা সম্ভব নামিয়ে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ সারছিলেন। কেউ বা নিছকই আড্ডা দিচ্ছিলেন। তবে প্রত্যেকেই খেয়াল রাখছিলেন চোখ যেন নীচের দিকে থাকে। এটাই দরবারি সহবত। বাদশার সামনে চোখ তুলে তাকানো ভীষণই স্পর্ধার কাজ। অভব্যতা, অশোভনতা। বিলকুল বেতমিজি।

প্রধান আমিরদের জন্য নির্ধারিত এলাকাটির তিন ধাপ নীচে আরও খানিকটা জায়গা রৌপ্যশৃঙ্খলে বেষ্টিত। এই শৃঙ্খলটির রং সাদা। এখানে দাঁড়িয়ে আছেন অন্যান্য আমির-ওমরাহ এবং সাধারণ রাজকর্মচারীর দল। দরবার কক্ষের সবচেয়ে নীচু, বিস্তীর্ণ চাতালটিতে কয়েকজন আসোয়ার, সাধারণ কিছু সিপাই আর প্রজাদের ভিড়। এখন রাজদর্শন অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব চলছে। একটু আগেই বাদশার সামনে দিয়ে মিছিল করে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাছাই করা কিছু হাতি, ঘোড়া, বাঘের দলকে। এখন চলছে বাজপাখি আর হরিণের লড়াই। শিকারি বাজ বন্য হরিণটির উপর বিদ্যুৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। হরিণের মাথা ঠুকরে, বড় বড় ডানা ঝাপটে বিপর্যস্ত করে তুলছে তাঁকে। অসহায় হরিণটি আত্মরক্ষার্থেই ব্যস্ত। লড়াই চলছে প্রায় একতরফাই। সে লড়াই তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করছেন বাদশা।

লড়াই দেখতে-দেখতেই আরও অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন জাহানারা। চোখ সরিয়ে নিলেন দরবার কক্ষ থেকে। এসব তাঁর ভাল লাগে না। চোখ সরিয়ে নিয়ে জাহানারা অন্য কথা ভাবছিলেন।

জাহানারা ভাবছিলেন তাঁর আম্মিজানের কথা, আরজুমন্দ বানু। শাহজাহান মসনদে বসার পর হিন্দুস্থান যাঁকে জানে মমতাজমহল বলে। জাহানারার মনে

পড়ে যাচ্ছিল সেই সব দিনের কথা, যে দিনগুলিতে আগ্রার বিরুদ্ধে বাগি হয়ে আব্বা-হুজুর কেবলই হারছিলেন শাহি ফৌজের কাছে। প্রতিটি লড়াইয়ে। আর হারতে-হারতে পিছু হঠছিলেন। পিছু হঠতে-হঠতে চষে ফেলছিলেন সারা হিন্দুস্থান। ঠেলতে-ঠেলতে দাদাসাহেব বাদশা জাহাঙ্গীর একেবারে নর্মদার দক্ষিণে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আব্বা-হুজুরকে। সেই সব দিনে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, পাঁচ-পাঁচটি মাসুম বাচ্চাকে নিয়ে আম্মিজানও ঘুরে বেড়িয়েছেন তামাম হিন্দুস্থানের পথে-প্রান্তরে, বনে-জঙ্গলে। দিন কেটেছে কখনও হাতির গাদেলায়, কখনও তাঁবুতে। কখনও ছটফট করেছেন অসহ্য গরমে, কখনও কুঁকড়ে গিয়েছেন প্রবল ঠান্ডায়।

কতই বা বয়স তখন জাহানারার? বারো? তেরো? অথচ সব স্পষ্ট মনে পড়ে। এইসব দিনে কখনই আম্মিজানকে মুখ ভার করতে দেখেননি জাহানারা। চারপাশে গোলা বারুদের বুলন্দ আওয়াজ, কোলে অসুস্থ সন্তান, স্বামী জং কি ময়দানে। ভরসা বলতে পাশে শুধু বৃদ্ধ হেকিম সাহেব। এমন আওহালের মধ্যে পড়েও আম্মিজান কখনই বিরক্ত করেননি শাহজাদা খুররমকে। শাহজাদা মন দিয়ে লড়াই করেছেন, আরজুমন্দ বেগম ঠান্ডা মাথায় ছেলেমেয়ে সামলেছেন। সেইসব দিনে জাহানারার মনে হত আম্মিজান যেন কোনও আওরত নয়, আম্মিজান যেন চিরকালের মা।

আসলে ভীষণই নরমসরম মানুষ আম্মিজান। আব্বা-হুজুর যেমন সব সময়ই লড়াই-লড়াই করছেন, লড়াই তেমনই না-পসন্দ আম্মিজানের। আম্মিজানের এই স্বভাবটিই পেয়েছে তারা দু'জন। সে আর দারা। এসব ভাবতে-ভাবতেই ঝরোকার কাছ থেকে কখন সরে এসেছেন টেরই পাননি জাহানারা।

সরে এসে দেখলেন সামনে যমুনা। এই প্রখর গ্রীষ্মে যমুনার জল কমে এসেছে। জেগে উঠেছে চর। তবে এই নতুন জেগে ওঠা চর ছাড়াও আরও চর আছে যমুনায়। সেখানে বসতিও আছে কয়েক ঘর। এরা অধিকাংশই চাষী। এই গ্রীষ্মে এরা যমুনার চরে তরমুজ ফলায়। গরমে স্বস্তি দেয় তরমুজ। গ্রীষ্মে তরমুজ আগ্রার প্রতিটি মানুষের খাদ্য বটে, পানীয়ও বটে। তবে সম্রাট পরিবারের তরমুজ আসে সমরখন্দ থেকে।

হঠাৎই বেশ গরম লাগছিল জাহানারার। পায়ে পায়ে কখন খোলা জায়গায় এসে পড়েছেন খেয়ালই ছিল না। দ্রুত পায়েই জাহানারা আবার ফিরে এলেন ঝরোকার কাছে। মাঝে মাঝে এক একটা দুপুর এভাবেই বেশ কাটে। দিবানিদ্রা

তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। দুপুরবেলায় নিজের ঘরে বসে পড়াশোনা করেন, লেখেন রুবাই। আর যেদিন দুপুরে পড়তে ইচ্ছে করে না কিছুই, সেদিনই চলে আসেন দেওয়ান-ই-আমের এই আম-দরবার দেখতে। বেশ লাগে। কত বিচিত্র মানুষ। কত বিচিত্র তাদের সমস্যা, কত বিচিত্র অভাব অভিযোগ। সবথেকে বিচিত্র বোধহয় আব্বা-হুজুরের বিচার। কোনও বিচারের রায় শুনে মনে হয় আব্বা-হুজুর ভীষণই দয়ালু। সুবিচারক। ইনসাফের ইমানদার। আবার কোনও বিচারের রায় শুনে সেই মানুষটিকেই মনে হয় ভীষণ নিষ্ঠুর। বেইনসাফির কদরদার। জাহানারা বিস্মিত হন। বিচিত্র এই শাহি খেয়াল।

লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছে। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিজয়ী বাজ, বিজিত হরিণকে। এবার শুরু হবে বিচার পর্ব। জাহানারা দেখলেন বাদশা মসনদের স্বর্ণশৃঙ্খল বেষ্টনীর মধ্যে ডেকে নিলেন উজির-ই-আজম সাদুল্লা খাঁ-কে। এই স্বর্ণশৃঙ্খল বেষ্টনীর মধ্যে সাধারণত বাদশা ছাড়া আর থাকেন, থাকতে পারেন শাহজাদা, শাহজাদিরা। সাধারণত দারাকে ডেকে নিয়েই বাদশা দরবারে বসেন। উদ্দেশ্য দরবারি রীত রিসালার সঙ্গে, শাহি কাজকর্মের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করানো। মনে মনে দারাকেই তিনি তার মসনদের ওয়ারিশ ঠিক করেছেন। আজ দারা নেই। বাদশা একাই বসেছেন দরবারে।

সাদুল্লা খাঁ একদম মসনদের পাশটিতে চলে গিয়েছেন। মসনদের উপর রাখা তাকিয়ায় আয়েশ করে হেলান দিয়ে বসে বাদশা নীচু গলায় কিছু আলোচনা করছিলেন তাঁর সঙ্গে। আমির-ওমরাহদের কথাবার্তাও যথারীতি চলছে। জনতার গুঞ্জন আগের চেয়েও বেড়েছে। সম্ভবত হরিণ বাজের লড়াই দেখার উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া।

ঠিক এমন সময়ই দূরে দেখা গেল এক আগন্তুককে। এগিয়ে আসছেন তিনি মসনদের দিকেই। সবার আগে সেদিকে চোখ গেল জাহানারার। দরবারে সবাই যে যার মতো আলাপচারিতায় ব্যস্ত। তাছাড়া সবাই তাকিয়ে বাদশার দিকে। তাই নবাগতের দিকে নজর পড়ল না কারও।

আগন্তুককে দেখেই কিন্তু চমকে উঠলেন জাহানারা। আগন্তুক আপাদমস্তক ফৌজি সাজে সজ্জিত, এমনকী কোমরে তলোয়ারটিও ঝুলছে। কে এই বেতমিজ? বাদশাহের দরবারে অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে প্রবেশ করছে! জাহানারা দেখলেন ক্ষীণ কটি, বৃষস্কন্ধ, দীর্ঘ মানুষটি ধীর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে আসছেন। তাঁর গ্রীবা উন্নত, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর।

জাহানারা দেখলেন আগন্তুকের দিকে এবার চোখ পড়েছে বাদশাহেরও।

কিন্তু একী, রণসাজে সজ্জিত মানুষটিকে তো তিনি তৎক্ষণাৎ বন্দি করার আদেশ দিলেন না? বরং উজির-ই-আজমের সঙ্গে কথা বন্ধ করে তিনি সোজা হয়ে বসছেন। স্থির, উন্নত শির। বাদশা সিধে হয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দরবার কক্ষও যেন মন্ত্রবলে শান্ত হয়ে গেল। বাদশাকে দেখে জাহানারার মনে হল আগন্তুক তাঁর পূর্ব পরিচিত। কিন্তু তাই বলে দরবারি শিষ্টাচার তিনি মানবেন না?

আগন্তুক সভাকক্ষের শেষ রৌপ্যশৃঙ্খলটির সামনে দাঁড়িয়ে শরীরের অর্ধাংশ ঝুঁকিয়ে দিলেন বাদশার দিকে। কুর্নিশ করা হলে জানালেন তসলিম। পরপর তিনবার। কয়েক পা এগিয়ে এসে আবার তসলিম জানালেন বাদশাকে। এবারও পরপর তিনবার। জাহানারা আশ্চর্য হলেন। সমস্ত দরবারি সহবত জেনেও আগন্তুক কেন এই ফৌজি পোশাকে?

বাদশাকে যথাযোগ্য অভিনন্দন জানিয়ে আগন্তুক এবার একটি কাগজ বের করলেন। তাড়াতাড়ি একজন ওমরাহ এগিয়ে এসে কাগজটি গ্রহণ করলেন আগন্তুকের হাত থেকে। সেখান থেকে সাদুল্লা খাঁর হাত ঘুরে সেটি চলে গেল বাদশার হাতে। জাহানারার কাছে এসব দৃশ্য অতি পরিচিত। শাহি কেতা অনুযায়ীই কোনও কিছু সরাসরি বাদশার হাতে তুলে দেওয়া যায় না; অন্তত দরবার কক্ষে। জাহানারা অনুমান করলেন, কাগজটি যুবার আনুষ্ঠানিক পরিচয়পত্র।

সাদুল্লা খাঁর হাত থেকে বাদশা যেভাবে কাগজটি নিলেন তাতেই তাঁর ব্যগ্রতা চোখে পড়ছিল। কাগজখানিতে চোখ বোলাতে-বোলাতেই বাদশার মুখমণ্ডল খুশির রোশনাইয়ে ভরে উঠল। পড়া শেষ করে তিনি যুবককে কাছে ডাকলেন। তারপর নিজেই মসনদ থেকে ছ-সাত ধাপ নেমে এসে আগন্তুককে আলিঙ্গন করলেন। ঝরোকার আড়াল থেকে জাহানারার দু-চোখ বিস্ময়ে, মুগ্ধতায় স্থির হয়ে রইল আগন্তুকের দিকে।

আগন্তুক যুবা বুঁদিরাজ রাও ছত্রশাল। চৌহান বংশীয় রাজা ছত্রশাল হাড়া। জাহানারা মনে মনে হিসাব করলেন, ইংলিশস্থানের পঞ্জিকা অনুযায়ী এটা সন ১৬২৯। অল হিজরি ১০৩৮।

দুই

মধ্য ভারতের কৌশিকী নদীর তীরে আশ্রম মহর্ষি জমদগ্নির। আশ্রমে প্রাণী বলতে দু'টি। মহর্ষি ও মহর্ষি-পত্নী রেণুকা। তাঁদের চার পুত্র চারিদিকে ছড়িয়ে থাকেন। এই মহা ঋষিকেই হত্যা করে বসেছেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর সহস্রার্জুন, মহর্ষির কামধেনুটির লোভে। মহর্ষিকে হত্যা করে, ঋষিপত্নীকে আহত, মৃতপ্রায় করে কামধেনুটি নিয়ে পালিয়েছেন তিনি।

মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম তখন পুষ্কর তীর্থে তপস্যা করছিলেন। যোগবলে সংবাদ পেয়ে তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে উঠেছেন। প্রতিশোধস্পৃহায় নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করেছেন ক্ষত্রিয় কুলজাতদের। এই হত্যাকাণ্ডে বাদ যাচ্ছে না শিশু, বৃদ্ধ কেউই। ইতিমধ্যেই কুড়িবার তিনি নিঃক্ষত্রিয় করেছেন পৃথিবীকে। পরশুরামের তাণ্ডবে শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন দেবতাকুল। ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধার জাত। তাদের অনুপস্থিতিতে ইতিমধ্যেই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে দেখা দিয়েছে অরাজকতা। দেব কারিগর বিশ্বকর্মা বসে-বসে তাই চিন্তা করছিলেন। কীভাবে পুনরায় সৃষ্টি করা যায় এই জাতটিকে। এ কাজ তাঁর একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। চাই সমস্ত দেবতার সহায়তা। তাঁর ভাবনার মধ্যেই খবর এল, আরও একবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছেন পরশুরাম। এই নিয়ে একুশবার। বিস্মিত হলেন বিশ্বকর্মা। মহর্ষি পত্নীকে ঠিক এই একুশবারই আঘাত করেছিলেন সহস্রার্জুন। তবে কি পরশুরাম এখানেই ক্ষান্ত হবেন? হতে পারেন। কিন্তু সে ভরসায় বসে থাকার সময় আর নেই।

দেব কারিগর ক্ষত্রিয় পুনর্নির্মাণ যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। মনে হয় কোনও দেবতাই এতে আপত্তি করবেন না। ক্ষত্রিয়দের ছাড়া পৃথিবীর শান্তি যেমন বিপন্ন, তেমনই মাঝে মাঝে দেবতাকুলের সংকটে তো এঁরাই এসে হাল ধরেন। অসুরদের অত্যাচারে তো শান্তিতে বাস করার জো-ই থাকত না, যদি না এই ক্ষত্রিয়কুল এসে পাশে দাঁড়াত।

যজ্ঞস্থল হিসেবে আবু পাহাড়ের শীর্ষদেশকে বেছে নিলেন বিশ্বকর্মা। অতঃপর সেখানে একটি পবিত্র অনলকুণ্ড বানিয়ে, স্তোত্রপাঠের ব্যবস্থা করে তিনি বেরোলেন অন্যান্য দেবতাদের আহ্বানে।

বিশ্বকর্মার আহ্বানে সাড়া দিয়ে একে একে সমস্ত দেবতাই এসে হাজিরও হলেন। এলেন মহাদেব। যজ্ঞস্থলে দীর্ঘ এক বিতর্কের পর দেবরাজ ইন্দ্রকে দেওয়া হল সৃষ্টিযজ্ঞ শুরু করার ভার। ভার পেয়ে দেবরাজ প্রথমে দুর্বাঘাস

দিয়ে তৈরি করলেন এক পুতুল। তাতে সিঞ্চন করলেন জীবনবারি। অতঃপর সেই পুতুলটিকে পবিত্র অনলকুণ্ডে ছুঁড়ে দিয়ে শুরু করলেন সঞ্জীবন মন্ত্রোচ্চারণ। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশিখা থেকে বেরিয়ে এল এক মূর্তি। তার ডান হাতে রাজদণ্ড, কণ্ঠে 'মার' 'মার' ধ্বনি। জন্ম নিলেন প্রমার বংশের প্রথম পুরুষ। দেবতারা এঁকে দিলেন আবু, থর ও উজ্জয়িনী অঞ্চলের শাসনভার।

এইভাবে একে একে ব্রহ্মার হাতে জন্ম নিলেন সোলাংকি বংশের প্রথম পুরুষ, দেবাদিদেব মহাদেব সৃষ্টি করলেন পুরিহার বংশের জনককে। সবশেষে এগিয়ে এলেন শ্রী বিষ্ণু।

অগ্নিশিখা থেকে শ্রী বিষ্ণু সৃষ্টি করলেন যে পুরুষটিকে, শ্রী বিষ্ণুরই মতো তাঁর দেহে চারটি হাত। চার হাতে চার প্রকার অস্ত্রের সম্ভার। দেবতারা এঁর নামকরণ করলেন চতুর্ভুজ চৌহান। ইনিই চৌহান বংশের জনক। এঁকে দেওয়া হল মাকাবতী নগরের ভার। বুঁদিরাজ রাও ছত্রশাল এই চৌহান বংশজাত।

শাহজাদি জাহানারা এই পৌরাণিক কাহিনিটি জানেন। আর জানেন দারা। বস্তুত দারাই তাঁকে এ রাস্তার রাহি করেছেন। না হলে মুঘল রাজকুমারীর হিন্দু পুরাণ অধ্যয়ন তো এক রীতিমতো অভাবনীয় ব্যাপার। হয়তো বা কারও চোখে গর্হিত অপরাধই। কাফেরি।

দারার কথা মনে আসতেই জাহানারার মুখ এক অন্য আলোয় ভরে গেল। এই ভাইটি তাঁর ভীষণই প্রিয়। শুধু পিঠোপিঠি বলেই নয়, দুই ভাইবোনের চিন্তা-ভাবনাতেও যে আশ্চর্য মিল। এই ভাবনার অংশীদার হয়নি অন্য আর কোনও ভাইবোনই। না সুজা, না মুরাদ। আওরঙজেব তো আবার সম্পূর্ণ উলটো পথের পথিক। রৌশনারা তাঁর এই সেজ ভাইটিরই অনুগামী।

দারা এক আশ্চর্য জিজ্ঞাসু বালক। তার জিজ্ঞাসার কোনও শেষ নেই। সব কিছুই তার জানা চাই, সব কিছুই তার পড়া চাই। নিছকই পড়ার খুশিতে সে এই বয়সেই পড়ে ফেলেছে মুসলমানের কোরান, হিন্দুর বেদ। পড়েছে পুরাণ কাহিনি, রামায়ণ, মহাভারতও। আশ্চর্য সংস্কারমুক্ত মন তার। হয়তো বা পড়তে-পড়তেই এমন একটি উদার মনের অধিকারী হয়ে গিয়েছে সে।

সদ্য দারা পনেরো পেরিয়ে ষোলোয় পা দিয়েছেন। চাঘতাই বংশের পুরুষরা এই বয়সে লায়েক হয়ে ওঠে, যুদ্ধে যায়। বাদশা আকবর তো তেরো বছর বয়সে সিংহাসনেই বসে পড়েছিলেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি তাঁর আতালিক বৈরাম খাঁকে সরিয়ে নিজেই শাসন শুরু করেন। অথচ ষোলোয়

পা দিয়েও দারা যেন এখনও না-লায়েক। ইতিমধ্যেই তার সাগাইয়ের কথাবার্তাও শুরু হয়ে গিয়েছে। আম্মিজান নিজে দারার দুলহন পছন্দও করে রেখেছেন। শাহজাদা পরভেজের কন্যা করিমউন্নিসা। আদর করে দারা যার নাম দিয়েছেন নাদিরা।

তো এতসব হলে কী হবে, দারা যেন কোথায় সেই ছোট্টটি রয়ে গিয়েছেন। যুদ্ধ বিগ্রহে তার মন নেই। পুঁথিপত্রেই তাঁর আকর্ষণ বেশি। আর যেখানে যা কিছু পড়বে, বাজিকে সেটি তার পড়ানো চাই-ই। এইভাবেই পড়তে-পড়তে জাহানারা জেনেছেন পুরাণের এই কাহিনি। জেনেছেন এই চার অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়ই ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। রাও ছত্রশাল এই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুলের শোণিতই বহন করছেন।

জাহানারা আবার মগ্ন হয়ে গেলেন ছত্রশালের চিন্তায়। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল সেই রাজপুত যোদ্ধার অঙ্গ সৌষ্ঠব। সে রূপ বর্ণনা করা জাহানারার পক্ষে সম্ভব নয়। অগ্নিকুলজাতের শরীর থেকে যেন নির্গত হচ্ছিল অগ্নিরই তেজ। প্রথম দর্শনেই রাজপুত্রকে তার হৃদয় দিয়ে বসে আছেন জাহানারা।

বুঁদিরাজ রাও ছত্রশাল হাড়াবংশীয় রাজপুত। সেই কতকাল আগে উত্তর ভারতে চৌহান বংশের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন রাজা মানিক রায়। এই মানিক রায়েরই এক উত্তরপুরুষ ইষ্টপাল হাড়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তখনও তৈমুর এদেশে ঢোকেননি। তারও প্রায় তিনশো বছর পর ওই বংশেরই রাও দেওয়া বুঁদিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লিতে মুঘল শাহি পত্তনেরও একশো চুয়াত্তর বছর আগের কথা সেটি। সেই বুঁদি এখন চাঘতাই মসনদের অতি বিশ্বাসী সামন্ত রাজ্য।

এখন বেলা অপরাহ্ন। সূর্য গড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমে। একটু আগেই আব্বা-হুজুরের সঙ্গে নাস্তা সেরে নিজের মহলে এসে বসেছেন জাহানারা। ছেলেমেয়েরা কাছে থাকলে তাদের সঙ্গে নিয়ে নাস্তা করতে বসা শাহজাহানের বরাবরের অভ্যাস। আগ্রা দুর্গেই হোক বা খোলা আকাশের নীচে, সময় এবং সুযোগ থাকলে কখনও এ অভ্যাসের ব্যত্যয় হতে দেখেননি জাহানারা। আসলে যতই লড়াকু হোন না কেন, মানুষটি ভিতরে ভিতরে ভীষণই সংসারী। বাদশাহি চালে, চলনে যেমন খুঁত নেই এতটুকু, তেমনই নিজের সংসারটিকেও কখনও অবহেলা করেন না আব্বা-হুজুর। আম্মির হাতে খেতে না পেলে

যেমন তাঁর খাওয়া হয় না, তেমনই খেতে বসেও ছেলেমেয়েদের দিকে সর্বদাই থাকে তাঁর হুঁশ নজর। আজকেই যেমন, খেতে বসে জাহানারার অন্যমনস্কতা তাঁর নজর এড়ায়নি। বলেছেন, "আজ তোমার নাস্তায় মন নেই কেন জাহানারা? শরীর সযুত আছে তো?"

একথার কোনও উত্তর ছিল না জাহানারার কাছে। অথচ আব্বা-হুজুর হলেও তিনি হিন্দুস্থানের বাদশা। বাদশার প্রশ্নের জবাব না দেওয়া বেতমিজি। জাহানারা তাই ঘাড় নেড়ে শরীর ঠিক থাকার কথা জানিয়েছেন, জানিয়েই মন দিয়েছেন খাওয়ায়। আসলে খাওয়ায় মন থাকবে কী করে? তাঁর মন তো তখন পড়ে সেই কিতাবের পাতায়। এই কিতাবটিই যে তিনি খুঁজছিলেন তেমন নয়, তবে মনের মধ্যে কোথাও নিশ্চয়ই এমন একটা ইচ্ছে লুকিয়ে ছিল। নইলে কিতাবটি পাওয়া মাত্র এমন ঘোরের মতো হামেহালই সে কিতাব মাথায় ঘুরবে কেন? নাকি আশিয়ানায় এই অবস্থাই হয়? সবসময় ঘুরে ফিরে মাথায় ঘুরপাক খায় একই চিন্তা? সব সময় মনের মধ্যে আশিককে নিয়ে মেতে থাকার বোধহয় এক নেশা আছে। এই নেশারই নাম কি ইশক, মহব্বত?

এই সব পুঁথিপত্র আসলে মহামতি আকবরের সংগ্রহ। আকবর নিজে নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু জ্ঞানার্জনের স্পৃহা তাঁর কখনই কমেনি। তাই ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদে তিনি গড়ে তুলেছিলেন বিবিধ বিদ্যার এক বিশাল সংগ্রহ। শেষ পর্যন্ত ফতেপুর সিক্রিতে থাকতে না পেরে আকবর রাজধানী আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আগ্রায়। তবে রাজধানী ফিরলেও সেই কিতাবমহল সম্ভবত ফেরেনি। কিছুদিন আগে পরিত্যক্ত প্রাসাদের কক্ষ থেকে দুই ভাইবোনে, বলা চলে, প্রায় আবিষ্কার করেছেন এই সংগ্রহ। দারা এবং তিনি। সেই সংগ্রহ দু'জনে তুলে এনেছেন আগ্রা দুর্গে।

যে কিতাবখানি নিয়ে জাহানারা এখন মাতোয়ারা সেটি পাওয়া গিয়েছে এই সংগ্রহের মধ্যেই। তবে এটিকে বোধহয় ঠিক কিতাব বলা চলে না। মুঘল সাম্রাজ্যের এক একটি দলিল এইসব লেখা। এই দলিলগুলি না থাকলে ইতিহাসের গর্ভে একদিন বিলীন হয়ে যাবে মুঘল শাহি। মুঘল শাহির প্রতিটি ঘটনা কলমবন্দ করে রাখার জন্য আছে ওয়াকেনবিশের দল। এরা যেমন বাদশার প্রতিটি কথাবার্তা যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করে রাখে, তেমনই নিজেরা যা দেখছে, শুনছে, তাও লিখে রাখে। জাহানারার হাতের দলিলটিও এমনই কোনও ওয়াকেনবিশের লেখা। তবে সাধারণত ওয়াকেনবিশরা দু-পাশে যা ঘটছে তার বিবরণই কলমবন্দ করে রাখেন। এই লোকটি, বোঝাই যাচ্ছে

কোনও সাধারণ ওয়াকেনবিশ ছিলেন না। ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে, যেখানে প্রয়োজন, ঘটনার পূর্ব ইতিহাসও কিছু কিছু লিখে গিয়েছেন। না হলে হাড়া বংশের ইতিহাস জাহানারা এখন পেতেন কোথায়? নাকি তাতে তার দরকারও খুব ছিল? ইশক অতো দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে হয় না। সে হয় সব দিক দেখে শুনে সাগাই ঠিক করার সময়। পরদাদা আকবর রাজপুত পরিবারগুলিতে এমন অনেক সাগাই-ই তো করেছেন। সে সব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানেই হয় না। জাহানারা ওয়াকেনবিশের লেখায় মন দিলেন।

আগ্রা-চিতোর রাস্তা ধরে আগ্রা থেকে চিতোর যাওয়ার পথে পড়ে কিল্লা রণথম্ভোর। এই কিল্লা দখলের ইন্তেজাম শুরু করেছেন বাদশা আকবর। বাদশা চান তামাম হিন্দুস্থানকে চাঘতাই নিশানের তলায় আনতে। অথচ নর্মদার উত্তর তীরই সব এখনও দখলে এল না মুঘল শাহির। সে পর্ব মিটলে তবে তো নর্মদা পেরোবে শাহি ফৌজ। নর্মদার উত্তর তীরে শাহি খায়েশের পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল দুই কিল্লা। কিল্লা চিতোর আর কিল্লা রণথম্ভোর। রাজপুত মর্যাদার দুই নিশান। সম্প্রতি কিল্লা চিতোরকে দখল করেছেন বাদশা। রণথম্ভোরের কিল্লাদার বুঁদিরাজ সুর্জন রাই ছিলেন চিতোরের রাণারই অধীন। বাদশা ভেবেছিলেন চিতোর দখল এলেই কিল্লা রণথম্ভোর আপনিই হাতে এসে যাবে তাঁর।

ভুল ভেবেছিলেন। সুর্জন রাই জানিয়ে দিয়েছেন, "বাদশা চিতোর দখল করে থাকতে পারেন, কিন্তু যদি তার মানে তিনি ভেবে থাকেন বুঁদিও জয় করেছেন, তাহলে ভুল করবেন।" তাই ফের শুরু হয়েছে যুদ্ধের তোড়জোড়। বাদশা জানেন, বসে থাকলে কখনই কোনও খায়েশ মেটানো যায় না। জানেন, রাজপুতকে পাশে দাঁড় করাতে না পারলে মুঘল শাহি কোনোদিনই হিন্দুস্থানে তার শিকড় নামাতে পারবে না। অতএব আবার সেজে উঠেছে শাহি ফৌজ।

শীত তখন যায় যায়। ন্যাড়া গাছে আবার সবুজ উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। এমনই এক সন্ধ্যায় বাদশা আকবর কিল্লা রণথম্ভোর অবরোধ করলেন। বাদশা নিজেই এসেছেন কিল্লা অবরোধে। তাঁবু ফেলে চারিদিক সরেজমিনে ঘুরে দেখছিলেন বাদশা। কিল্লাটি উঁচু একটি পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে। সে পাহাড় এত খাড়াই আর এত উঁচু যে মুঘল সেনার পক্ষে পাহাড়ে উঠে দুর্গ দখল একেবারেই অসম্ভব। বাদশা ভাবছিলেন রাতের অন্ধকারে বাছাই কিছু সিপাই পাঠিয়ে দুর্গ দখল করবেন। কিন্তু দুর্গ দেখে সে পরিকল্পনা তখনই বাতিল করে দিতে হল।

দ্বিতীয় পথ কামান দেগে দুর্গ উড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু সে কামান বসাবেন কোথায়? দুর্গের ঠিক উলটোদিকেই রয়েছে আর একটি পাহাড়। অন্তত এই পাহাড়টির মাথাতে কামান তুলতে পারলেও কাজ হয়ে যেত। কিন্তু ভারী কামান সেখানেই বা তুলবেন কী করে?

পাহাড়ি জঙ্গলে ঘুরতে-ঘুরতেই দ্বিতীয় দিনে একটি পথ পেয়ে গেলেন বাদশা। খোঁজ নিয়ে জানলেন এই পথ ব্যবহার করে স্থানীয় কিছু মানুষ। এই পথ ধরে তারা উঠে যায় পাহাড়ের মাথায়। দেখেই বুঝলেন বাদশা, পথটি বিপজ্জনক। কিন্তু দ্বিতীয় কোনও রাস্তাও তো নেই। বাদশা হুকুম দিলেন ঐ পথেই কামান তুলতে। পরপর তিনদিন লেগে গেল কামান তুলতে। মারা গেল পাঁচজন সেনা। কিন্তু কামান পাহাড়ে উঠতেই বাদশা বুঝলেন ফতে জং তাঁর হয়েই গিয়েছে।

কিন্তু এবারেও হিসেবে ভুল হল বাদশাহের। মুঘল সৈন্য কিল্লা অবরোধ করার পর মাস গড়িয়ে গেল। এই এক মাস ধরে শাহি কামান অবিরাম গোলা বর্ষণ করে গিয়েছে দুর্গের প্রাকারে। পাথরের দেয়ালে ফাটল ধরেছে, কিন্তু এতটুকুও বোধহয় চিড় খায়নি রাজপুতের মনোবল। কিল্লাদার হতাশ না হলেও এবার হতাশ হয়ে পড়লেন স্বয়ং বাদশা।

শীত চলে গিয়েছে। কেবলমাত্র ভোরবেলার গা শিরশির করে ওঠা হাওয়ায় টের পাওয়া যায় শীত এসেছিল। দিনের বেলা রোদের তেজ প্রতিদিনই অল্প অল্প করে বাড়ছে। পাহাড়ি গরমে তখন উশখুশ করে ওঠে ফৌজের লশকর, বাদশা লক্ষ করেছেন। বেশ বুঝতে পারছিলেন তিনি, অবরোধ আর বেশিদিন চালানো যাবে না।

এই সময়ই এক সকালে কিল্লাদার সুর্জন রাই দেখলেন মুঘল কামান আর গর্জন করছে না। তবে কি অবরোধ তুলে পালিয়ে গেল মুঘল ফৌজ? তাড়াতাড়ি এক প্রকোষ্ঠের কাছে এসে সুর্জন দেখলেন গর্জন থেমেছে ঠিকই, কিন্তু কামান সরেনি, বা কামানের মুখও ঘোরেনি। সুর্জন চিন্তিত হলেন। খাবারদাবার শেষ হয়ে আসছে। আর কতদিন এভাবে প্রতিরোধ চালানো যাবে বোঝা যাচ্ছে না। তবে কি তাঁকেও শেষপর্যন্ত... সুর্জনের ভাবনার মধ্যেই দুর্গরক্ষী এসে সামনে দাঁড়াল, "মহারাজ।"

সুর্জন প্রকোষ্ঠ থেকে চোখ সরিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন।

"রাজা মান এসেছেন।"

রাজা মানসিংহ! চিতোরের ডরপোক রাণা বিহারীমল্লের নাতি! চিতোরের